দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বাংলা সাহিত্য : আদিবাসী প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন চিত্রণের যে ধারা সাম্প্রতিক সময়েও বহমান, প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের বাংলা সাহিত্যে সেই রূপায়ণ বিস্তৃত আকারে না থাকলেও আদিবাসী মানুষদের আনা-গোনা সাহিত্য প্রাঙ্গণে একেবারে ছিল না - এ কথা বলা যায় না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত চর্যাপদগুলি এক বিশেষ ধর্মের গোষ্ঠীসাধনার নিদর্শন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সংঘগত ধর্মসাধনার উদ্দেশ্যে এগুলো রচিত হলেও সমাজের অন্ত্যজ জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে এতে। প্রাচীন বাংলার সমাজচিত্রের খুঁটি-নাটি ধরা পড়েছে এই গীতিসমূহে। গুপ্ত শাসনের সময় থেকে বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাংলায় প্রবেশ করলেও প্রাচীন বাংলা মূলত ছিল আদিম জাতির বাসভূমি। চর্যার রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে চর্যার গানগুলি রচিত হয়। এই সময়কালের বাংলার সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। "...এই দেশে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাবে একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া ছিল। ইহার পূর্বের বৌদ্ধ পাল রাজাগণ প্রায় এইদেশে চারিশত বৎসর রাজত্ব করেন। মধ্যভারতে যে বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বঙ্গদেশে সেই বৌদ্ধ ধর্মেরই শাখা-বিশেষ নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল।"[১] ফলে, বোঝা যাচ্ছে বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাবের উত্তুঙ্গ সময়েই বেশিরভাগ চর্যাগান রচিত হয়। বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ শাখার তাত্ত্বিক বা অধ্যাত্ম সাধনার প্রকাশ এর আত্মা হলেও চর্যাকারগণ এর দেহ রচনা করলেন বাংলার প্রকৃতি এবং হাড়ি, ডোম, কাপালিক, শবর-শবরী প্রভৃতি অনার্য ও অন্ত্যজ মানুষের জীবনচর্চার চিত্রে। শবর পা-এর ২৮ এবং ৫০ সংখ্যক পদে লোকালয় বা নগর থেকে দূরে পর্বতের ওপরে বসবসকারী শবর-শবরীর প্রেমময় উন্মত্ত দাম্পত্য জীবনের ছবি এঁকেছেন। দেখা যায়,

পাহাড়ের টিলার ওপর এক পর্ণকুটিরে শবর-শবরীর বাস। শবরীর পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা। কাছেই কার্পাস আর কঙ্গুচিনার খেত চাঁচলের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কাংনি ধান পাকলে তার থেকে তৈরি মাদকে জ্যোৎস্নারাতে মাতাল হয় শবর দম্পতি। আদিবাসী জীবনের এমন সহজ প্রকাশ উঠে আসে চর্যাগানে। বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগের মধ্যপর্বের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য ধারা। বাংলায় পালরাজাদের শাসনকালে বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রসার হলেও সেন রাজাদের সময় থেকে সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্যই বর্ধিত হয়। এই সময়ে মঙ্গলকাব্যগুলোর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, দেশীয় ধর্ম সংস্কৃতির যে চর্চা সেনযুগের আগে বাংলার বুকে চর্চিত হতো তা অবলুপ্ত হল না, সমাজদেহে থেকে গেল এবং "সেকালের বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই সন্ধিযুগে, দেশীয় প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নূতন আদর্শ এই উভয়ের সংঘাত-মুহূর্ত্তে বাংলা পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যগুলির সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।"[২] মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা গেল লৌকিক দেব-দেবীর ওপর আরোপিত হয়েছে পৌরাণিক আভিজাত্য। শিব, চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রমুখ দেবীর পূজা বৈদিক প্রভাবের পূর্ব থেকেই বাংলার লোকায়ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন পৌরাণিক শিবের দেহ নির্মিত হয়েছে লৌকিক কৃষি দেবতা শিবের হাড়-মজ্জার ওপর।[৩] প্রাথমিকভাবে শিবের আর্যায়নের পর শিবের পৌরাণিক মহিমায় ভর করে লৌকিক নারী দেবতা মনসা ও চণ্ডীর আর্যায়ন ঘটে। মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা বা প্রাচীন ধারা এই লৌকিক দেব-দেবীদের মঙ্গলগীত। পরবর্তীকালে পৌরাণিক দেব-দেবীর মঙ্গলকাব্যের ধারা গড়ে ওঠে। *শিবায়ন*-এ পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানের মিশ্রণ স্পষ্ট। গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহ থেকে শিবের মর্ত্যে নেমে এসে কৃষিকাজ করা, পার্বতীর বাগদীনি বেশ ধারণ বা শিবের শ্বশুরঘর থেকে মর্ত্যে একবার কোচনি পাড়ায় গমন নিঃসন্দেহে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণকে স্পষ্ট করে। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী ও মনসার

নির্মাণেও লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্রব লক্ষণীয়। জল-জঙ্গলে ঘেরা গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশের লৌকিক সংস্কারে সর্পপূজা থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন বৌদ্ধ প্রভাবিত বাংলায় বৌদ্ধ দেবী জাঙ্গুলীর প্রভাব মনসার নির্মাণে থাকতে পারে, আবার তেমনই তিনি দাক্ষিণাত্যের মুদ্‌মা, মন্‌চাম্মা প্রভৃতি সর্পদেবীর অস্তিত্বের কথা ও মনসার ওপর তাদের প্রভাব থাকার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন।[৪] *মহাভারতে* "নাগ" সম্প্রদায়ের কথা থাকলেও মনসার উল্লেখ পাওয়া যায় না। জরৎকারুর উল্লেখও সামান্য। মহাভারতে নাগসম্প্রদায়ের অধিপতি ছিলেন বাসুকি। এই সম্প্রদায় আচারে-ব্যবহারে-বাসস্থানে মূলত অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে হলেও মহামুনি কশ্যপের ঔরসে নাগজাতির জন্মের কাহিনি তাতে আর্য মহিমা দিয়েছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংস্কৃত পুরাণে স্ত্রী সর্পদেবতারূপে "মনসা"কে পাওয়া যায় এবং তিনি বাসুকির ভগিনির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠেন। এই সমস্ত পুরাণে মনসা শিবের শিষ্যারূপে কল্পিতা হলে মনসামঙ্গল কাব্যে তিনি শিবের কন্যারূপে আদৃত। এভাবে "মনসা" বৈদিক বা আর্য সংস্কৃতির দেবী নন, বরং লৌকিক কোনো নারীদেবীর বিবর্তিত ও সংস্কৃতরূপ বলেই মনে হয়। মনসার মতোই চণ্ডীও লৌকিক দেবী, যিনি পরবর্তীকালে আর্য গরিমা পেয়েছেন। বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত বা প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণে চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তুলনামূলক অর্বাচীন পুরাণ তথা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, দেবী ভাগবত প্রভৃতিতে চণ্ডীর দেখা মেলে। এই চণ্ডীর উৎপত্তি অনার্য সংস্কৃতি থেকে হলেও শেষপর্যন্ত তিনি পৌরাণিক পার্বতীরই আরেক রূপ হয়ে যান। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের দু'টি অংশে তথা কালকেতু-ফুল্লরা অংশ বা *আখেটিক খণ্ড* ও ধনপতি অংশ বা *বণিক খণ্ডে* দেবী চণ্ডীর দুই ভিন্ন রূপ দেখি। প্রথম কাহিনিতে দেবী চণ্ডী ব্যাধসমাজের দেবী ও পশু রক্ষয়ত্রী, দ্বিতীয় কাহিনিতে তাঁর ভক্তের মঙ্গলকারী কমলেকামিনী রূপ। এ দেশের আদিম জনজাতি ওঁরাওদের মধ্যে "চান্ডী" নামক দেবীর পূজার কথা জানিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখছেন-

"যাহাই হউক, এই ওঁরাও জাতির দেবতা চাণ্ডী ও বর্তমান হিন্দু সমাজের চণ্ডী যে মূলতঃ একই দেবতা এই বিষয় নিঃসন্দেহ।"[৫] পশুশিকার ও অরণ্যনির্ভর জীবনে এই ধরনের দেবীর কল্পনাই মূর্ত হয়েছে ব্যাধজীবনের গোধারূপিণী চণ্ডীর মধ্যে। এই অরণ্যচারীদের পূজিতাই ধীরে ধীরে স্থান পেয়েছিল হিন্দু স্ত্রী-সমাজে, তাদের মন্ত্রহীন পুজোয়। পরবর্তীকালে পৌরাণিক দেবী দুর্গা বা পার্বতীর সঙ্গে অভিন্না হয়ে হিন্দু সমাজে পাকাপাকি আসন করে নেন চণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনিতে সর্বোপরি দেবীর বরাভয়রূপ দেখতে পাওয়া গেলেও *আখেটিক খণ্ডে*-র দেবীর প্রাথমিক নির্মাণ অরণ্যের ও পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে, যিনি ব্যাধসমাজে প্রতিষ্ঠিতা। এই কাহিনিতে লৌকিক কাহিনির প্রাধান্য, অন্যদিকে ধনপতির কাহিনিতে চণ্ডী হিন্দু স্ত্রীসমাজে প্রচলিত পূজা ও পৌরাণিক মহিমা নিয়ে সমগ্র হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠার যাত্রা নিয়ে উপস্থিত। অবশ্য এই অংশের চণ্ডীর "কমলেকামিনী" রূপের নির্মাণে বৌদ্ধ আদ্যাশক্তির প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য- "চণ্ডী ধনপতিকে ছলনা করিবার জন্য এই 'কমলে কামিনী' মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীর এই পরিকল্পনা বৌদ্ধধর্ম হইতে আসিয়াছে।...তন্ত্র বা শক্তি প্রভাবিত দেশে এই আদিদেব আদ্যাশক্তি নামে পূজিতা হন। 'কমলে কামিনি'র পরিকল্পনায় এই চণ্ডীকে বৌদ্ধ আদ্যাশক্তি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।"[৬] চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কাহিনি সংগঠনের অঞ্চলের যে ভৌগোলিক আভাস পাওয়া যায়, তা মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় বা কলিঙ্গ লাগোয়া অংশ, কাহিনিতেও কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এই কলিঙ্গ ও দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল গভীর অরণ্যে ঢাকা এবং আদিবাসী অধ্যুষিত। অরণ্যনির্ভর ও মৃগয়াজীবী অনার্য কালকেতু ও তার ব্যাধজীবন সম্ভবত শবর সম্প্রদায়ের জীবনকেই প্রতিনিধিত্ব করেছে। আধুনিক সময়ের কথাকার মহাশ্বেতা দেবী *ব্যাধখন্ড* উপন্যাসের ভূমিকাতে লিখেছেন- "লোধাদের লেখা থেকেই কালকেতু তাদের আদিপুরুষ, দুর্গাষ্টমীতে

স্বর্ণগোধা শিকারের সুফল...,এ সব তথ্য পাই।"[৭] দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*-র *সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া* গানে কৃষ্ণদাস রায়ের ভণিতায় সাঁওতাল বিদ্রোহ সময়কালের ছবি পাওয়া যায়। যে সময়কালের উল্লেখ গানের মধ্যে পাওয়া যায় তা ১২৬২ সাল অর্থাৎ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ। গানের মধ্যে বিদ্রোহী সাঁওতালদের দ্বারা লুঠ, নরহত্যার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। সাঁওতালদের ওপর হওয়া অত্যাচারের সচেতনতা তো নেই, বিদ্রোহের কারণ হিসেবে রয়েছে সাঁওতালদের মদ-মাংস, টাকা ও ক্ষমতার ওপর লোভের কথা। বেদে বা বেদিয়াদের উল্লেখ, তাদের জীবিকার কথা খণ্ড চিত্রে পাই *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র *মহুয়া* পালায়।

মধ্যযুগ পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকযুগের গোড়ার দিকে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *বিবিধ প্রবন্ধ* গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে *বাঙ্গালীর উৎপত্তি* নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে অনার্য ও এদেশের আদিম অধিবাসীদের ওপর খানিক আলোকপাত করেছেন। প্রশ্ন উত্থাপন ও যুক্তির দ্বারা তিনি প্রথমেই ঐতিহাসিকদের আর্য জাতির উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে আগমনের কথা মেনে নেন এবং তথ্য দেন এদেশে তাদের আগমনের আগে যে জাতির বাস ছিল তারা অনার্য, অর্থাৎ অনার্যরা এদেশের তুলনামূলক আদিম অধিবাসী। এদেরই আর্য বৈদিক সাহিত্যে "দস্যু" বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই "দস্যু"র শব্দটির বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বুঝেই প্রাবন্ধিক লিখলেন- "দস্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ- ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাস শব্দ ঋক্‌বেদে ব্যবহৃত নহে। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। তাহারা আর্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত - তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্যেরাও ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ - আর্যেরা গৌর।"[৮] বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই বাঙালির উৎপত্তিকে ভাষাগত দিক দিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন। তিনি এদেশে আর্যজাতি অধ্যুষিত এলাকা ও ভাষার সঙ্গে অনার্যপ্রধান অঞ্চল ও ভাষার সমীকরণ

মেলাতে গিয়ে দেখেছেন বাংলা আর্য ভাষা হয়েও, তা আর্যাজিত এলাকা হয়েও অনার্যমানুষপ্রধান। তিনি বাংলা ভাষার সূত্র ধরেই বাঙালির সন্ধান করতে চেয়েছেন এই প্রবন্ধে। ফলে স্পষ্টতই বলেছেন- "তাহার বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস লিখিব না - সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে।"[৯] আবার বাংলার ভেতরের ও চারপাশের অনার্য জাতির ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চাননি বলেই বাংলার চারপাশের অনার্যজাতির নাম তুলে ধরেছেন। অনার্য জাতির স্বরূপ তিনি নির্ধারণ করতে চেয়েছেন ভাষার সূত্র ধরে, যথা- দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য, কোলবংশীয় অনার্য। বাংলা সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই নৃতাত্ত্বিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। জন মার্শম্যান সম্পাদিত "দিগ্‌দর্শন" পত্রিকার ১৩শ ভাগ, ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল *নানাদেশীয় লোকের শববিষয়ক ব্যবহার* প্রবন্ধটি। "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয় *আদিম মনুষ্য* শীর্ষক প্রবন্ধ। "ভারতী" পত্রিকায় শরৎচন্দ্র মিত্র, গিরিবালা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবীর যথাক্রমে *ব্যাঘ্র-পূজা*, *সিংভূমের কোলজাতি* ও *নীলগিরির টোডা জাতি* প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩০০, ভাদ্র ১৩০০ ও মাঘ ১৩০২ সংখ্যায়। সতীশচন্দ্র ঘোষের চাকমাজাতির ওপর আলোচনা প্রকাশিত হয় "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র ৪র্থ সংখ্যায়, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে *(চাকমাদিগের ভাষা-তথ্য)* ও "প্রবাসী" পত্রিকার ৭ম ভাগ ৮ম সংখ্যা ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (*চাকমা জাতির সংস্কার কর্ম্ম*)। বাংলা গদ্যের সূচনাপর্ব থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়কাল পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রে নৃতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষা-জীবন-সংস্কৃতিকে তুলে আনার প্রয়াসও লক্ষিত। "প্রবাসী" পত্রিকার ১৩ ভাগের ১ম খণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ সংখ্যা ১৩২০ বঙ্গাব্দে ও ১৪শ ভাগের ২য় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা ১৩২১ বঙ্গাব্দে ছোটনাগপুরের ওঁরাও জাতির জীবন ও ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছেন নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়। সাঁওতালদের জীবন, গান, পূজা-পদ্ধতি, নাগা ও কুকি জাতির কথা, মুণ্ডা জাতির

পরিচয় প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত নৃতাত্ত্বিক আলোচনা স্থান পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রগুলিতে। বাংলা সাহিত্যের ভ্রমণকাহিনি ধারায় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামৌ* নামক ভ্রমণবৃত্তান্তটি অন্যতম। "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় এই ভ্রমণকাহিনির প্রথম অংশ ও যথাক্রমে ফাল্গুন ১২৮৭, আষাঢ় ১২৮৮, শ্রাবণ ১২৮৮, আশ্বিন ১২৮৮, ফাল্গুন ১২৮৯ সংখ্যায় এর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশটি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর মেজো দাদা সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর চার বছর পরে *সঞ্জীবন সুধা* সংকলনে এই লেখাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। সংকলনকালে তিনি এই রচনার ষষ্ঠ অংশটিকে বাদ দেন। *পালামৌ*-র ভূয়সী প্রশংসা করেন রবীন্দ্রনাথ এইভাবে- "পালামৌ'-ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে-একটি অকৃত্রিম সজাগ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না।...কিন্তু সঞ্জীবের অন্তরে সেই জরার রাজত্ব ছিল না। তিনি যেন একটি নূতনসৃষ্ট জগতের মধ্যে একজোড়া নূতন চক্ষু লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। 'পালামৌ'তে সঞ্জীবচন্দ্র যে বিশেষ কোনো কৌতূহলজনক নূতন কিছু দেখিয়াছেন, অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু সর্বত্রই ভালোবাসিবার ও ভালো লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন।"[১০] সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁর গৃহিণীপনার অভাব যে তাকে বাংলা সাহিত্যজগতে যথার্থ প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি, রবীন্দ্রনাথ এ আক্ষেপও করেছেন। তবু তাঁর অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় *পালামৌ* উৎকৃষ্ট রচনা এবং বাংলা ভ্রমণকাহিনিতে অরণ্যের আদিম অধিবাসী কোলদের প্রথম বিস্তৃত পরিচয় ও রমণীয় বর্ণনা এই গ্রন্থকে ব্যতিক্রমী করেছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে লেখক কোল বালকের শারীরিক সুষমার বিবরণ দিয়েছেন এবং অরণ্যপ্রকৃতির বুকেই অরণ্যের সন্তানদের রূপ যথার্থ প্রস্ফুটিত হয় বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এই গ্রন্থের চতুর্থ অংশে কোলদের নৃত্য ও পঞ্চম অংশে বিবাহের পরিচয় দিয়েছেন।

"কোল" মূলত austro-asiatic ভাষাবংশের অন্তর্গত একটি শাখা। এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় আছে, যথা- সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ প্রভৃতি। "কোল" ভাষাগোষ্ঠীকে ইউরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকরা "মুণ্ডা" নামে চিহ্নিত করলেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "কিন্তু 'মুণ্ডা" নামটি তেমন উপযোগী নহে। ভারতবর্ষে ইহা কেবল কোল-জাতির একটি বিশিষ্ট গণকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় – রাঁচির আশপাশের কোল জাতীয়দের জন্য সীমিত এই নামকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের কোনো আবশ্যকতা নাই। kol "কোল" এই নামটি ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। উড়িয়া, বাঙ্গালী ও বিহারীরা "কোল" বলিলে, দ্রাবিড়-ভাষী ওঁরাও, কন্ধ, এবং মাল-পাহাড়িদের বাদ দিয়া, মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, ভূমিজ, খাড়িয়া, কোর্‌কু প্রভৃতিদেরই বুঝে; সুতরাং এই ব্যাপক সংজ্ঞা ব্যবহার করাই ভাল।"[১১] *পালামৌ* গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে অসুর সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আছে। এই অসুর নামক আদিবাসী সম্প্রদায় কোলদের বা বাকীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে গভীর অরণ্যে বা পাহাড়ে বাস করে। এদের উল্লেখ ঋক্‌বেদ, উপনিষদ ও পুরাণে পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্র সেন বিভিন্ন গ্রন্থপাঠ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন আসুর ভাষা ব্যবহারকারী গোষ্ঠীই অসুর। এই ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখাভুক্ত। তিনি লিখেছেন- "...এ স্থলে অসুর শব্দের দ্বারা খুব সম্ভব শুধু অনার্যই বোঝাচ্ছে না, বিশেষ একপ্রকার ভাষার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সম্ভবত মুণ্ডা (অতএব অস্ট্রিক) জাতীয় ভাষাকেই আসুর ভাষা বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতের উপাখ্যানে অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতিকে যে অসুররাজ বলির সন্তান বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা একেবারেই নিরর্থক নাও হতে পারে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে অসুরদের ম্লেছছভাষী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এই উক্তিরও বিশেষ সার্থকতা থাকতে পারে।...এ স্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে আধুনিক কালেও কোল বা মুণ্ডা ভাষার একটি উপশাখার নাম আসুরি, এটিও পূর্ব ভারতেরই ভাষা। এই আসুরি উপভাষাটি হয়তো পূর্ব

ভারতের প্রাচীন আসুর ভাষারই ক্ষীণ স্মৃতিটি বহন করছে।"[১২] অবশ্য জানা যায়, অসুররা এমন এক আদিবাসী জনগোষ্ঠী যারা ধাতুর ব্যবহার জানত, বিশেষত লোহা গলানোতে পারদর্শী ছিল। বলবান এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার যোগ ছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন। বর্তমানে ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা ও ছত্তিশগড়ে এদের দেখতে পাওয়া গেলেও ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে রাঁচি জেলার নেতারহাটকেই তাদের আদিনিবাস বলে চিহ্নিত করেছেন। আরও বলেছেন- "১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের জনসংখ্যা ৪৮৬৪ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যার ০.১৩ শতাংশ।"[১৩] এই অসুররা আবার তিনটে উপবর্ণে বিভক্ত– বীর, বিরাজিয়া ও আগারিয়া– যার উল্লেখ *পালামৌ*-এর লেখক করেছেন দ্বিতীয় অংশের তথ্যসূত্রে[১৪], বীররা আবার একাধিক নামে পরিচিত, যথা- সোলকা, থুপু, কোল, জাঠ। ১৯৫৬ সালের "সিডিউল ট্রাইবস্ মডিফিকেশন অর্ডার"-এ এই অসুর গোষ্ঠী স্বাধীন ভারত সরকার স্বীকৃত আদিবাসী তালিকাভুক্ত হয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাজকাহিনী*-র চারটি কাহিনি যথা *শিলাদিত্য, গোহ, পদ্মিনী, বাপ্পাদিত্য* প্রকাশিত হয় "ভারতী" পত্রিকায়, ১৩১১ বঙ্গাব্দে। *গোহ* ও *বাপ্পাদিত্য* কাহিনিতে ভীলদের কথা আছে, আর্য সাহিত্যে এদেরই "ভীল্ল" নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমান রাজস্থানের পটভূমিতে সূর্যপুত্র শিলাদিত্য-এর বংশধরদের সঙ্গে ভীলদের সখ্যতা, বিদ্রোহ, ভুল বোঝাবুঝি ও শত্রুতার আখ্যানই গ্রন্থিত এই কাহিনিগুলোতে। শিলাদিত্য ও পুষ্পবতীর পুত্র অনাথ গোহ ব্রাহ্মণ ঘরে কমলাবতীর স্নেহে বড়ো হচ্ছিল মালিয়া পর্বতের নীচে বীরনগরে। সেখানে পাহাড়ের ওপরে ভীল রাজা মাণ্ডলিকের রাজত্ব। আপন তেজ, সাহস ও দীপ্তিতে ভীলদের মন জয় করা গোহকে একদিন নিজেদের রাজা বলে গ্রহণ করে ভীলেরা, সেই সিদ্ধান্তে শীলমোহর দেন অপুত্রক ভীল রাজা মাণ্ডলিকও। ভীল যুবকের আঙুলের রক্তে রাজতিলক হয় গোহের। ইতিমধ্যে মাণ্ডলিকের বহু বছরের নিখোঁজ ভাই ফিরে এসে

নিজের রাজত্বের অধিকার দাবি করলে জটিলতা তৈরি হয়। গোহের ছুরি নিয়ে মাণ্ডলিক কর্তৃক ভাইকে হত্যা করার পরিকল্পনা, স্নেহের বশে পরিকল্পনাচ্যুত হওয়া, পূর্বেই ভাইয়ের মৃত্যু ও দুর্ঘটনায় মাণ্ডলিকের মৃত্যু এবং ঘটনাস্থল থেকে গোহের ছুরি প্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি ঘটনার সন্নিবেশ ভীলেদের মনে রাজপুত গোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ তৈরি করে। ভীল ও রাজপুত রাজবংশের মধ্যে বিশ্বাস ও সন্দেহের, সম্মান ও অশ্রদ্ধার, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সম্পর্ক চলতে থাকে পুরুষানুক্রমে। গোহের কাহিনি শেষ হয় ভীলদের সঙ্গে রাজপুতদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ অবনতির আশঙ্কার আভাসে। গোহ ভীলদের সন্তানের মতো রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী রাজপুতদের শাসনে ভীলরা যারপরনাই অত্যাচারিত হয়েছিল, যার প্রসঙ্গ রয়েছে *বাপ্পাদিত্য* কাহিনিতে– "গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভীলেরা আট-পুরুষ পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল।"[১৫] দৈহিক নিগ্রহ, মৃত্যুদণ্ড, ভীলদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো অত্যাচারের সাক্ষী ছিল ভীলেরা। সেই অত্যাচার চরমতায় পৌঁছেছিল নাগাদিত্যের সময়ে, যখন ভীলেদের ওপর অত্যাচারে সংযোজিত হয়েছিল নারী নিগ্রহের মতো ঘটনা- হাজার হাজার ভীল রমণীকে দাসী হিসেবে নাগাদিত্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন রাজপুতদের ঘরে ঘরে। ভীলদের সংস্কৃতির অংশ যে পশুশিকার, তার ওপর রাজনিষেধাজ্ঞা ভীলেদের আট-পুরুষের সহ্যশক্তি ও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। বনে শিকার না পেয়ে ভীলদেরই শিকার করার লক্ষ নিয়ে নাগাদিত্য যখন এগোচ্ছেন, তখন বিদ্রোহী ভীলদের হাতে নিহত হন রাজা নাগাদিত্য। বিদ্রোহী ভীলেরা অধিকার করে প্রাসাদ। নাগাদিত্যের স্ত্রী নাবালক পুত্র বাপ্পাদিত্যকে নিয়ে কোনওক্রমে পালিয়ে আসেন প্রাসাদ থেকে, নাবালক বাপ্পার দায়িত্ব দেন পূর্বপুরুষ রাজা গোহের পালনকারী পরিবারের ওপরেই। বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে যেমন আশ্রয় পায় রাজপুত্র বাপ্পাদিত্য, তেমনই আশ্রয় পায় বিদ্রোহী ভীলেদের দ্বারা প্রতারিত গোহের রাজতিলক কাটা

ভীলবংশের সন্তানেরাও - দুই ভীল বালক ও এক ভীল কন্যা। ভীল ভাই বালিয়, দেব ও ভীল দিদির সঙ্গে বেড়ে ওঠা রাজপুত্র বাপ্পাদিত্য মানসিংহকে হত্যা করে চিতোরের সিংহাসনে বসেন ভীল রাজতিলক নিয়ে এবং রাজপুত রাজ্যাভিষেকে ভীলদের দ্বারা রাজতিলক এঁকে দেওয়ার প্রথাকে আইনে পরিণত করেন। পরবর্তীকালে মানসিংহকে নিজের মামা জেনে ভীলেদের প্রতি অকারণ ক্ষুব্ধ হন– "তাঁর সমস্ত রাগ মালিয়া পাহাড় জয় করে ভীল-রাজত্বের ওপর গিয়ে পড়ল। বাপ্পা মালিয়া পাহাড় জয় করে ভীল-রাজত্ব ছারখার করে চলে গেলেন।"[১৬] *রাজকাহিনী*তে রাজপুতদের সঙ্গে যে ভীলেদের সংঘর্ষের কাহিনি রয়েছে তারা কোল সম্প্রদায়ভুক্ত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখছেন- "রাজপুতনায় ও মালবে দ্রাবিড়দের অপেক্ষা দাক্ষিণদেরই প্রসার বা বাস অধিক ছিল বলিয়া মনে হয়- এই অঞ্চলের ভিল-জাতি (মধ্য-যুগের আর্যভাষায়, প্রাকৃতে, যাহাদের "ভিল্ল" বলিয়া অভিহিত করা হইত) এখন আর্য গুজরাটি রাজস্থানি ও মালবি বুলি গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা কোল-শ্রেণির অনার্যই ছিল।"[১৭] কর্নেল টডের রাজস্থানের কাহিনিকে গ্রহণ করে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছিলেন *বিদ্রোহ* ও *মিবাররাজ*। *বিদ্রোহ* উপন্যাসে বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্যের সময়কাল ও ভীল বিদ্রোহের কাহিনি এবং *মিবাররাজ*-এ গোহ বা গুহ-র সময়কাল ও কাহিনি স্থান পেয়েছে। রাজস্থানের কাহিনিতে গোহ বা গুহ বা গুহার কাহিনির সঙ্গে বাপ্পাদিত্যের কাহিনির বহুল সাদৃশ্যহেতু এই দুই ব্যক্তি অভিন্ন কিনা- সেই নিয়ে মতভেদ থাকলেও স্বর্ণকুমারী দেবী *মিবাররাজ* (১৮৮৭) উপন্যাসের পরিশিষ্ট অংশে টডের অনুসরণে দু'জনকে পৃথক ব্যক্তিরূপেই প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং উপন্যাসে গুহার কাহিনিকে স্থান দিয়েছেন। টডের কাহিনিতে আছে "...যে হেতু ভীল-রাজা মণ্ডলিকা একদ্‌বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রীতি সহকারে ইদর রাজ্য গুহাকে অর্পণ করিলেন। কিন্তু গুহা তদনন্তর বিনাপরাধে ও বিনা প্রয়োজনে ভীল-পতির প্রাণসংহার করিয়া নিতান্ত কৃতঘ্ন স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।"[১৮] গুহার দ্বারা

বৃদ্ধ ভীলরাজার মৃত্যুর ঘটনার কাহিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্ণকুমারী দেবীর কলমে পৃথক। টডের তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন কাহিনিতে। *বিদ্রোহ* (১৮৯০) *মিবাররাজ*-এর দু'শো বছর পরের ঘটনা। এই উপন্যাসে ভীলেদের রাজপুতদের প্রতি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, জুমিয়া-নাগাদিত্যের বন্ধুত্ব, জুমিয়ার পিতা জঙ্গুরের জুমিয়াকে নাগাদিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করা ও ব্যর্থ হওয়া, বন্ধু জুমিয়ার পালিতা কন্যা সুহার প্রতি নাগাদিত্যের আকর্ষণ, সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি ও সর্বোপরি ঘটনাক্রমে নিয়তিবাদের প্রভাব নাগাদিত্যের জীবনের শোচনীয় পরিণতি নিয়ে আসে। গুহা কর্তৃক ভীল-রাজা মন্দালিকের হত্যা ও ভীলরাজ্য রাজপুতদের অধীনে চলে যাওয়ার অসন্তোষের আগুন ভীলদের মধ্যে বিশেষত জঙ্গুরের মধ্যে জ্বলছিল। যৌবনবয়সে রাজা আশাদিত্যকে হত্যার চেষ্টা করে ৪০ বছরের জন্য নির্বাসিত হন। এই ৪০ বছরে রাজপুত হত্যার সিদ্ধান্তে কোনও পরিবর্তন হয়নি, বরং ফিরে এসে ভীলেরা জায়গিরদারদের দাস হয়ে গেছে দেখে সেই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হয়েছে। যে জুমিয়া পিতার শত তিরস্কারেরও রাজা নাগাদিত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি, সুহার প্রতি নাগাদিত্যের আকর্ষণ, উভয়ের বিয়ের দিন সুহার পরিচয়কেন্দ্রিক জটিলতায় সেই জুমিয়ার হাতেই নাগাদিত্য ও তাঁর প্রথম মহিষীর মৃত্যু হয়। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভীলেরা রাজপ্রাসাদ দখল করে। রাজার পুত্র বাপ্পাদিত্য ও সুহারকে নিয়ে ব্রাহ্মণ হরিতাচার্য ইদর ত্যাগ করেন এবং অনুতপ্ত জুমিয়া রাজপরিবারের রক্ষায় প্রাণত্যাগ করে – "বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে, ভীলেরা জয়ী। ইদর হইতে ক্ষত্রিয়গণ পলাইয়াছে-ভীলের রাজ্য ভীল পুনরায় পাইয়াছে, মহা উৎসবের মধ্যে জুমিয়ার ভ্রাতা রাজসিংহাসনে বসিয়াছে।"[১৯] উপন্যাসে ভীলদের সংস্কার, জীবনযাত্রা, ভাষার পরিচয় লেখিকা যেমন তুলে এনেছেন, তেমনই তুলে ধরেছেন ভীলেদের কাছে প্রতিশ্রুতি ও বন্ধুত্বের মূল্যকেও। *বিদ্রোহ* শুধু রাজপুতদের বিরুদ্ধে ভীলেদের বিদ্রোহের কাহিনি নয়, নাগাদিত্য ও জুমিয়ার বন্ধুত্বের গল্পও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজা স্বনামধন্য স্বর্ণকুমারী দেবী রাজস্থানের ভীল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক উপাদানকে উপজীব্য করে উপন্যাস রচনা করলেও, রবীন্দ্রনাথের কলমে আদিবাসী জীবন-সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে পূর্ণাঙ্গ রচনা পাঠক পায়নি। দীর্ঘদিন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে থাকার কারণে কোনো কোনো রচনায় সাঁওতাল জীবনের ছায়ামাত্র পড়েছে। বাঁকুড়ার জনসভায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ১৮ই ফাল্গুন দেওয়া ভাষণে গ্রামবাংলার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। সেখানে স্পষ্ট করেই তিনি গ্রামবাংলা বলতে শুধু প্রাকৃতিক শোভা নয়, মানুষকে বুঝিয়েছিলেন। এই মানুষগুলোর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসার প্রসঙ্গেই টেনেছেন বীরভূমের রুক্ষ মাটির সঙ্গে লেগে থাকা সাঁওতালদের, বলেছেন- "সেখানকার মানুষ যারা-সাঁওতাল—সত্যপরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি।"[২০] ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত *পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থের *কোপাই* (১লা ভাদ্র, ১৩৩৯), *খোয়াই* (৩০ শ্রাবণ, ১৩৩৯), *ক্যামেলিয়া* (২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৯) কবিতায় খণ্ডচিত্রে সাঁওতালরা এসেছে, সাঁওতালপাড়া এসেছে কখনও মূলভাবনার সহযোগী হিসেবে, কখনও কবিতায় নিসর্গ নির্মাণের উপাদানরূপে, কিন্তু কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে নয়। একমাত্র *বিচিত্রা* (১৩৪২) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত *সাঁওতাল মেয়ে* (৪মাঘ, ১৩৪১, শান্তিনিকেতন) কবিতার মূল অবলম্বন সাঁওতাল রমণী, যার দৈহিক মাধুর্যের পাশাপাশি অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যক্ত করেছেন কবি। সাঁওতালদের শোষণ-বঞ্চনাময় জীবনের ইঙ্গিতও রয়েছে কবিতার কিছু পঙক্তিতে- "আমি তা'রে লাগিয়েছি কেনা-কাজে করিতে মজুরী,/ মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি/ পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।/ সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভ'রে নিয়ে আসে মাটি।।"[২১] ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত *রাজর্ষি* উপন্যাসে কুকি জনজাতির কথা এসেছে। রবীন্দ্র সমসাময়িককালে অন্য কোনো সাহিত্যিকের রচনাতেও সেই অর্থে বিস্তৃতভাবে আদিবাসী জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উঠে আসেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্য বিষয়প্রকরণে পূর্ববর্তী

সময়ের থেকে আমূল পাল্টে গেল। শুধু তাই নয়, ‘‘কল্লোল’’ (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩), ‘‘কালিকলম’’ (প্রথম প্রকাশ ১৯২৬), ‘‘প্রগতি’’ (প্রথম প্রকাশ ১৯২৭) পত্রিকাকে কেন্দ্র করেও বাংলা সাহিত্যে একটা আন্দোলন ঘটে গেল। শুধু পত্রিকাকেন্দ্রিক সাহিত্য আন্দোলন নয়, রুশ বিপ্লব, অসহযোগ আন্দোলন, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা তথা মার্কসীয় দর্শনের চর্চা ইত্যাদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বাঙালির চিন্তা-চেতনায় যে প্রসার এনেছিল, তাতেই বাংলা সাহিত্য এতদিনের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। প্রান্তিক সমাজ ও প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্চা উঠে আসে সাহিত্যের মূল বিষয়রূপে। বিশ শতকের কল্লোলের সময়ে গল্পে-উপন্যাসে রানিগঞ্জের কয়লাখাদানের জীবনকে চিত্রিত করে বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমাকে প্রসারিত করে বাংলার পাঠককে চমকে দেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। রানিগঞ্জ-অণ্ডাল অঞ্চলে কাটানো শৈশব এবং পরবর্তীকালে কয়লাখনিতে কিছুদিনের কাজের ফলে খনি অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে কাছ থেকে দেখেছিলেন লেখক। গল্পে-উপন্যাসে সেই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। আদিবাসী জীবন তথা সাঁওতাল জীবন সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল পৈতৃক বাসস্থান বীরভূমের রূপসীপুর গ্রামে। শৈশবে মায়ের মৃত্যুর পর মামারবাড়িতে দিদিমার কাছে বড়ো হওয়া শৈলজানন্দ বাল্যবন্ধু নজরুলের সঙ্গে ব্রিটিশ সেনার বাঙালি পল্টনে নাম লেখাতে গিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ না করতে পেরে কিছুদিনের জন্য বাবার কাছে চলে গেছিলেন। বাবার কাছে শুনেছিলেন সাঁওতালদের ভালুক ধরার গল্প। সেইসময়কে তিনি শাশ্বত করে রেখেছেন *আমার বন্ধু নজরুল* গ্রন্থে। কয়লাখাদানের কুলি-কামিন বাউরি মেয়ে বিলাসি ও সাঁওতাল নান্‌কুর ভালোবাসা, বিশ্বাসহীনতার গল্প *কয়লাকুঠি* প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাসিক ‘‘বসুমতী’’ সংখ্যায়। *কয়লাকুঠি* ছাড়াও *ঝুমরু*, *বনবিহগী*, *মরণ-বরণ*, *বন্দী*, *নারীর মন*, *সাঁওতাল* গল্পে আদিবাসী জীবন, কয়লাখাদান অঞ্চলের

আদিবাসী কুলি-কামিনদের হৃদয় রহস্য, প্রেম-ভালবাসা-জিঘাংসার চিত্র উঠে এসেছে। *নারীর মন* গল্পে পাই আদিবাসী কুলি-কামিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মানব মনের জটিল মনস্তত্ত্বের সন্ধান। *সাঁওতাল* গল্পে ব্যক্তিগত অনুভবের বদলে আছে একটা বিশেষ অঞ্চলের সাঁওতাল মানুষজন, তাদের সংস্কার এবং অনাদিবাসী শাসক কর্তৃক শোষণ ও অত্যাচারের চিত্র। *জোহানের বিহা* করুণসুরে বাঁধা গল্প, যার মধ্যে গল্পকার চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি সাঁওতালদের বাহা উৎসবকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আদিবাসী জীবনকে, কয়লাখাদানের আদিবাসী কুলি-কামিনের জীবনকে কথাসাহিত্যে স্থান দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের সামনে এক অজ্ঞাত জীবনের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। যাদের জীবন বাঙালি পাঠকের আশেপাশে ছিল, কিন্তু সমাজ-সংস্কার-অনুভব-দ্বন্দ্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার ছিল না - শৈলজানন্দ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে সেই প্রবেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেল। *কয়লাকুঠির দেশ*-এর কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় উপন্যাসের তুলনায় শৈলজানন্দ গল্পকাররূপে বিশেষ সার্থক ছিলেন। তাঁর গল্পজুড়ে আদিবাসী কুলি-কামিনদের একচ্ছত্র অধিকার। ১৩৪১ সালে প্রকাশিত স্বল্পায়তনের *পাতালপুরী* উপন্যাস আসলে "টকি-বায়োস্কোপের" জন্য লেখা চিত্রনাট্য। কাহিনির বিন্যাস সরল ও একরৈখিক। মুংরা, টুমনি ও বিলাসীর পারস্পরিক আকর্ষণ, প্রেম ও জিঘাংসার গল্প। আড়কাঠি হারাধন চক্রবর্তীর চাতুরি ও প্রলোভনে পা দিয়ে অন্যান্য সাঁওতালদের সঙ্গে মুংরা ও টুমনিও তাদের সাঁওতালগ্রাম ছেড়ে পৌঁছে যায় রানিগঞ্জের কয়লাখাদানে। ঔপন্যাসিক লেখেন, "গ্রামে ছিল তাহাদের শান্ত স্নিগ্ধ কেমন যেন একটি সুনির্মল সুগম্ভীর প্রশান্তি, কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিল সে-সবের কিছুই নাই।"[২২] তারসঙ্গে হারাধনের দেখানো বিলাতি মদ, সিগারেট, জামা-কাপড়ের স্বপ্ন ভাঙতেও বেশি সময় লাগল না। কয়লাকুঠির কুলি-মজুরদের জীবন তুলে আনার পাশাপাশি লেখক আড়কাঠিদের দরিদ্র সাঁওতালদের

বছরের অভুক্ত সময়ের সদ্ব্যবহারের অমানবিকতা ও ধনতন্ত্রের কারবারিদের নির্লজ্জ লোভকে স্পষ্ট করেছেন উপন্যাসের দু'টি অংশে। হারাধন চক্রবর্তীর স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে, "বৎসরের ঠিক এই সময়টায় বনচারী এই-সব সাঁওতালদের ঘরে অন্ন থাকে না, জমির উৎপন্ন ফসল ফুরাইয়া যায়, বনের পাখী, বনের কাঠবিড়ালী মারিয়া দিন চালায়। আমাদের হারাধন তাহা জানে। এবং জানে বলিয়াই বছরের ঠিক এই সময়টায় সে এই-সব সাঁওতাল পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়ায়।"[২৩] মদ ও সিগারেট খাইয়ে, ঋণ দিয়ে, দারিদ্র্যহীন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে সাঁওতালগ্রাম থেকে খাদের কাজে কম পয়সার মজুর চালান দেয় হারাধন। খাদানের মালিক ধনতন্ত্রের প্রতিভূ ন্যূনতম নিরাপত্তার ব্যবস্থা না রেখে কম সময়ে বেশি মুনাফার হিসেব কষে শুধু- "প্রাণের ভয়ে ম্যানেজার তাহাদের চাকরি ছাড়িয়া দিল। আর একজন নূতন ম্যানেজার আসিতে না আসিতে এলোপাথাড়ি যত খুশী কয়লা তুলিয়া লইতে হইবে। ইহাই মালিকের হুকুম। উপরের মাটি নীচে ধ্বসিয়া পড়িবে, চারিদিকে ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিবে, মানুষের বাস এখান হইতে চিরদিনের মত ঘুচিয়া যাইবে, - তা যাক! খাদের মালিকের এত-সব দেখিতে গেলে চলে না, - তাঁহার চাই টাকা।"[২৪] টুমনি যে মুংরার সঙ্গী হয়েছিল, তার কারণ অবশ্য কোনও খিদে বা লোভ নয়, মুংরার প্রতি টুমনির অকৃত্রিম, সুগভীর ভালোবাসা। টুমনির বাবা গ্রামের মোড়ল তাদের বিয়েতে রাজি না হওয়ায় অবলীলায় মুংরার সঙ্গে কয়লার দেশে চলে আসে টুমনি, খানিকটা জোর করেই। পরবর্তীকালে বাবার গ্রামে ফিরে যাওয়ার আহ্বানও অনায়াসে অগ্রাহ্য করে সে। কিন্তু মুংরা টুমনির এই ভালোবাসার মর্যাদা দেয়নি। বাউরি মেয়ে বিলাসীর রূপের মোহে শুধু টুমনির ভালোবাসাকে অস্বীকার করেনি মুংরা, বিলাসীকে নিয়ে ঘর বাঁধার মোহে জীবন থেকে টুমনিকে সরিয়ে দিতে তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে গেছে। মুংরার এই আচরণে টুমনির ভালোবাসার স্বপ্ন ভেঙেছে, সে সরে গেছে মুংরার জীবন থেকে। অথচ বিলাসীর সঙ্গেও মুংরার ঘর বাঁধা হয় না। বিলাসী

মুংরার প্রতি বিশ্বস্ত নয়। ঘটনাচক্রে বিলাসীর কারণেই মুংরার জেল হয় এবং নির্জন জেলজীবনে মুংরা টুমনির ধ্যান করে। উপন্যাসের শেষে লেখক মুংরাকে তার ফেলে আসা গ্রাম ও হারিয়ে যাওয়া প্রেম টুমনির কাছে ফিরিয়েছেন, সন্তানসুখে মিলনান্তক সমাপ্তি টেনেছেন। উপন্যাসে বাক্যের ক্রিয়াপদে সাধুভাষার ব্যবহার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শৈলজানন্দের সাহিত্যকৃতিতে কয়লাখাদানের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক তাপস বসু লিখছেন- "কলকাতা থেকে প্রায় দু'শ কিলোমিটার পশ্চিমে রানীগঞ্জ কয়লাখনি শুরু হয়েছে এবং তা প্রায় আশি কিলোমিটার পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ ও পূর্বদিকের বিস্তৃতি প্রায় তিরিশ কিলোমিটার। এই সুবিস্তৃত কয়লাকুঠি অঞ্চলের অধিবাসী সাঁওতাল-বাউরী-কুলী-কামিনদের আদিম জীবনের ঈর্ষা-দ্বেষ, প্রেম-ভালোবাসার অকুণ্ঠ-উদ্দাম জীবনযাত্রাকে শৈলজানন্দ তাঁর কৈশোর-যৌবনের মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে একান্ত সান্নিধ্যে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে মানুষ-মানুষীর স্থুল অথচ কৃত্রিমতা বর্জিত সরলজীবন তরুণ শৈলজানন্দের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।"[২৫] একদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া নানাবিধ ঘটনার প্রতিক্রিয়া, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা – দুইয়ের সমবায়েই বাংলা সাহিত্যে শৈলজানন্দ ভিন্নধারার প্রবর্তন করেন। বাংলা সাহিত্যের সেই ধারার দরজা দিয়ে প্রবেশ করল সমাজের প্রান্তিক, অন্ত্যজ, খেটেখাওয়া বঞ্চিত মানুষের দল, যাদের মূলধারার সমাজ ও সাহিত্য এতদিন ব্রাত্য করে রেখেছিল।

দেশের মূলস্রোতের অনার্য জাতির প্রতি অবহেলা, জীবন-সমাজ-সংস্কারকে জানবার অনাগ্রহই তাদেরকে একইদেশে পৃথক করে রেখেছিল। বিভূতিভূষণ তাঁর *আরণ্যক* উপন্যাসে এমনই এক অনুভবকে ব্যক্ত করেছিলেন- "...ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস- এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস-বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই-কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়,

অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থিকঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনো ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অপমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না। আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি, বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি - উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি - সভ্যতার গর্বে উন্নতনাসিক আর্যকান্তির গর্বে আমি প্রাচীন অভিজাতবংশীয় দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি, রাজকন্যা ভানুমতিকে মুণ্ডা কুলী-রমণী ভাবিতেছি - তাহাদের কত আগ্রহের ও গর্বের সহিত প্রদর্শিত রাজপ্রাসাদকে অনার্যসুলভ আলো-বাতাসহীন গুহাবাস, সাপ ও ভূতের আড্ডা বলিয়া ভাবিতেছি। ইতিহাসের এই বিরাট ট্র্যাজেডি যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল-সে নাটকের কুশীলবগণ এক দিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী, তরুণ রাজপুত্র জগরু পান্না - এক দিকে আমি, আর আমার পাটোয়ারি বনোয়ারীলাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং।”[২৬] *আরণ্যক* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। ভানুমতী তাদের অনার্য ইতিহাস ও ইতিহাসের স্মৃতি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় চরিত্র হয়ে ওঠে। শুধু একক আরণ্যক নয়, ভানুমতী বা দোবরু পান্না নয়, বিভূতিভূষণ তাঁর *কালচিতি*, *শিকারি* গল্পেও ফুটিয়ে তুলেছেন বর্তমান ঝাড়খণ্ডের অরণ্য প্রকৃতি ও তাঁর সঙ্গে লগ্ন থাকা আদিবাসী মানুষদের জীবনকে। বিভিন্ন সময়ে বিভূতিভূষণ আসাম, চট্টগ্রাম, মধ্যপ্রদেশ, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া জেলার বিভিন্ন বনাঞ্চল, শিমুলতলা, সারান্ডা, রাঁচি, হাজারিবাগের বনাঞ্চল সন্নিহিত অঞ্চল ঘুরেছেন এবং সেই সময়কে শাশ্বত করেছেন বিভিন্ন ভ্রমণকাহিনি ও দিনলিপিতে। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত *অভিযাত্রিক*-এ মধ্যপ্রদেশের গোঁড় জনজাতির জীবন ও স্বভাবকে

স্পষ্ট করেছেন এইভাবে- "বেশ সহজ ও সরল জীবনযাত্রা। তবে এরা বড় অলস। জীবনযাত্রার অনাড়ম্বর সরলতাই এদের অলস ও শ্রমবিমুখ করে তুলেছে। পয়সা দিতে চাইলেও কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এরা সহজে করতে রাজি হয় না। পয়সা রোজগার করবার বিশেষ ঝোঁক নেই। বিনা আয়াসে যদি আসে তো ভালো, নতুবা কষ্ট করে কে আবার পয়সা উপার্জন করতে চায়! সবগুলি বন্যগ্রামেই এই অবস্থা।"[২৭] ১৯৩৪ সালের মে থেকে ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লেখা দিনলিপি *উর্মিমুখর*-এ সাঁওতালি নাচ ও সাঁওতালদের আগুন পোহানোর চিত্র ও খণ্ডকথায় বন্যপশুদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার ইঙ্গিত উঠে এসেছে। *হে অরণ্য কথা কও* ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যেকার দিনলিপি। অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে আরণ্যক সাঁওতালদের কথা স্থান পেয়েছে এখানে। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত *বনে পাহাড়ে* ভ্রমণকাহিনিতে ঘাটশিলা-গালুডি-চাইবাসা থাকাকালীন সেখানকার সাঁওতাল-হো অধিবাসীদের যে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকে টুকরো চিত্রে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রকাশিত *কুশল পাহাড়ি* গ্রন্থে এনেছেন বিরহড় জাতির কথা, খাদ্যাভ্যাসের কথা- "বিরহোর জাত এদিকে বেশি। তারা বনের কাছে শিমের লতা তুলে দ্যায় – যেখানে সেখানে। ওই শিমই তাদের খাদ্য। আর পাখি, খরগোশ, গিরগিটি, সাপ সবই ওদের খাদ্য। অল্পে সন্তুষ্ট, খাটতে চায় না। মহুয়ার তাড়ি খেয়ে তিন দিন বুঁদ হয়ে রইল। টাকার মূল্য বোঝে খুব কম।"[২৮] শ্রম প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশের গোঁড় ও বর্তমান ঝাড়খণ্ডের বিরহড় জাতির মধ্যে একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করেছিলেন লেখক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বীরভূমের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান। ফলে, জমিদারি প্রথার প্রতি, ভেঙে পড়া সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি একধরনের মমত্ববোধ তাঁর ছিল। তাঁর লেখায় সেই আকর্ষণ লক্ষ করা গেছে। শুধুমাত্র জমিদারি প্রথা বা অভিজাত সম্প্রদায় নয়, তাঁর সাহিত্যে রাঢ় বঙ্গের

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবনযাত্রার ছবিও উঠে এসেছে। অন্ত্যজ জীবনের বিশ্বস্ত রূপকার তিনি। তাঁর প্রসারিত দৃষ্টিতে আদিবাসী জীবনও বাদ যায়নি। *পাষাণপুরী* (১৯৩৩), *প্রেম ও প্রয়োজন* (১৯৩৫), *কালিন্দী* (১৯৪০), *সপ্তপদী* (১৯৫৮), *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬)-তে আদিবাসী জীবন তথা সাঁওতাল জীবনের কথা উঠে এসেছে। স্বাধীনতা-পূর্বে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে *কালিন্দী* (১৯৪০)-তে কালিন্দী নদীর বুকে জেগে ওঠা চরকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া লোভ-দ্বন্দ্ব-সংঘাতই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। অহীন্দ্রকে ঘিরে সাঁওতালদের বুকে জেগে উঠেছে "রাঙাঠাকুর" সোমেশ্বর রায়ের স্মৃতি। স্মৃতির পথ বেয়ে উপন্যাসে এসেছে সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনি। জঙ্গলাকীর্ণ চরে বসতি করে চরকে মনুষ্য বসবাসের যোগ্য করে তুলেছিল সাঁওতালরা। চরে বসবাসকারী সাঁওতালদের রীতি-নীতি, উৎসব, সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনি যেমন উঠে এসেছে, তেমনই সাঁওতালদের মধ্যেকার গোষ্ঠীজীবনের ভাঙনের ইঙ্গিতও দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। চরের জমি নিয়ে বিবাদের জেরে নিঃস্ব, শোষিত সাঁওতালদের শেষপর্যন্ত রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে চলে যাওয়া তাদের জীবনে বারবার উদ্বাস্তু হওয়ার চরমতম ট্র্যাজেডি ও কঠিনতম সত্যিকেই প্রকাশ করে। *পাষাণপুরী, প্রেম ও প্রয়োজন, সপ্তপদী*-তে খণ্ডচিত্রে সাঁওতালদের কথা এসেছে। *অরণ্য-বহ্নি*-র মূল বিষয়বস্তু ১৮৫৫ সালের সিধু-কানুর নেতৃত্বে ঘটা সাঁওতাল বিদ্রোহ। শুধু উপন্যাস নয়, *শিলাসন, কমল মাঝির গল্প, একটি প্রেমের গল্প, ঘাসের ফুল* প্রভৃতি ছোটোগল্পে আদিবাসী জীবনের নানাবিধ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কথাকার। রবীন্দ্র-পরবর্তী সময়ের ভিন্নধারার লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় স্বল্প পরিসরজুড়ে এসেছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা। মানিক তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে মার্ক্সবাদের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে আনতে না পারার খেদ তিনি পূরণের চেষ্টা করেছিলেন *দর্পণ* উপন্যাসে আংশিকভাবে সাঁওতাল জীবন রূপায়ণের মধ্যে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়

১৩৫২ সালের আষাঢ়ে। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে ড. সরোজ মোহন মিত্র লিখছেন- "উপন্যাসটির নাম দর্পণ। শ্রেনিবিভক্ত সমাজের এই দর্পণ। একদিকে লোকনাথ, উমাপদ, হেরম্ব, হীরেন, শশাঙ্ক, দিগম্বরী আর অন্যদিকে কৃষ্ণেন্দু, রম্ভা, বীরেশ্বর, মহীউদ্দিন আর শম্ভুর দর্পণ। অত্যাচারী ধনী হেরম্বদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ঝুমুরিয়া গ্রামবাসীর বিক্ষোভের দর্পণ। এককালে আদর্শবাদী, হতাশায় ম্রিয়মান ঘুষখোর দারোগা শৈলেন দাসের দর্পণ। বস্তিজীবনের, বাগ্‌দীপাড়ার, দেহ-বেচা রূপজীবী অশিক্ষিত নিম্নস্তরের মানুষদের দর্পণ। এই উপন্যাসের নেতা কৃষ্ণেন্দু হলেও নায়িকা রম্ভা। মানিকবাবুর বাস্তবনিষ্ঠ মার্কসবাদী দৃষ্টিতে শোষণজর্জর সমাজের এক অনবদ্য দর্পণ। স্বাধীনতা পূর্ব জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যের মধ্যে হেরম্বদের বিরুদ্ধে নতুন ঐতিহ্য মানিক এই উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন।"[২৯] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাস শোষণহীন সমাজ ও প্রতিবাদের দর্পণ হয়ে উঠেছে যেখানে উপন্যাসে সাঁওতালরা নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে হেরম্বকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। উপন্যাসের পটভূমি ঝুমুরিয়া গ্রাম, অন্যতম চরিত্র হেরম্ব চক্রবর্তী। ঝুমুরিয়া থেকে দু'ক্রোশ দূরে এক বিচ্ছিন্ন শালবনের কাঠ চালান দেবার কন্ট্রাক্টরি করে হেরম্ব। এই কাজের সূত্রেই সাঁওতালজীবনের সঙ্গে তার পরিচয়। দীর্ঘ পনেরো বছর সাঁওতালদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে সাঁওতালরা এক উৎসবের দিনে তাকে সাঁওতাল হবার অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। হেরম্বের সাঁওতাল সম্প্রদায় সম্পর্কে উপলব্ধি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঁওতালজীবনজনিত সত্যদর্শনের প্রতিবিম্ব- "ফাঁকায় মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধে, বাঁশের চোঙায় তেল রাখে, পুরু কাগজের মত ঘন মোটা কাপড় কোমরে জড়ায় আর পিঠে ছেলে বাঁধার বা গায়ে দেবার চাদর করে, কাঠের চিরুণীতে চুল আঁচড়ায়, খোঁপায় ফুল গোঁজে আর বাবরিতে লাল কাপড়ের ফালি জড়ায়, শালপাতার মোটা বিড়ি বানিয়ে টানে, মেয়েপুরুষে ভাত বা মহুয়ার মদ খায় আর আগুন জ্বেলে মাদল বাজিয়ে নাচে গায় - সুস্থ সবল সুশ্রী কালো দেহ

আর সরল স্বাধীন দৃঢ় মন নিয়ে হিংসাদ্বেষহীন নির্ভয় নিশ্চিন্ত নির্লোভ শান্তিপূর্ণ জীবন কাটায়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে ব্যক্তিগত সম্পদের বোধ নেই, ভেদাভেদ বোঝে না। দলের প্রধান দলেরই দান, দলের ইচ্ছায় সে প্রধান, অনিচ্ছায় নয়। মেয়েরা স্বাধীন, সমান, প্রধান সম্মানীয়া- সভ্য জগতের স্বাধিকারচ্যুতা সমস্ত নারী যখন পরাধীন পণ্যা মাত্র।"[৩০] সভ্যজগতের নারীর সঙ্গে আদিবাসী নারীর শুধু এই অবস্থানগত পার্থক্য নয়, ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সাঁওতাল মেয়েদের পরিণত বয়সের আগে সন্তান হয় না এবং দুই সন্তানের মধ্যে কম করে দু'তিন বছরের ব্যবধান থাকে। বিপরীতে হেরম্বের স্ত্রী সতীরাণী দশ বছরে সাত সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এই পরস্পর বিপরীত চিত্রের মাধ্যমে তথাকথিত অসভ্য বলে দেগে দেওয়া সাঁওতালজাতির সংস্কারগত সুসভ্য সচেতনতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন লেখক। একটি সাঁওতাল মেয়ের ভালোবাসাজনিত বিয়ে নিয়ে সাঁওতাল সমাজে গণ্ডগোল তৈরি হলে হেরম্বের হস্তক্ষেপে সেই সমস্যা মেটে। সাঁওতালরা হেরম্বের মিটমাটের মধ্যস্থতাকে মেনে নিয়েছিল তার আর্থিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতার কারণে নয়, তাকে যে সাঁওতাল হবার সম্মান প্রদান করেছিল, সেই প্রদত্ত সম্মানকে মর্যাদা দিয়ে। কিন্তু হেরম্ব তাঁর নৈতিক অধঃপতন, লোভ, কামনা ও ক্ষমতার মদমত্ততায় সাঁওতালদের দেওয়া সেই সম্মানকে রক্ষা করতে পারেনি। সাঁওতাল নারীর অসম্মানের প্রতিবাদে সাঁওতালরা হেরম্বকে ত্যাগ করে চলে যায়। সাঁওতালদের এই প্রতিবাদ তথা হেরম্বকে বর্জন করাকে হেরম্ব মেনে নিতে পারে না- "তাকে কিছু না বলে, বোঝাপড়ার সুযোগ না দিয়ে, সবাই চলে গেল। সতীরাণীর অবাধ্যতার চেয়ে একদল অসভ্য নরনারীর এই নির্বিরোধ নিঃশব্দ অবজ্ঞা যেন আরও বেশী অসহ্য মনে হয় হেরম্বের। সতীরাণীকে নোয়ানো যায়। হ্যাঁ হেরম্ব জানে, হুকুমে না আসুক, হাত ধরে টানলে না আসুক, দাবী করার বদলে একটু সকাতর ব্যথাজীর্ণ অসুস্থতার ভান করলেই সতীরাণী ছিটকে এসে বক্ষলগ্না হবে। কিন্তু এই সব অসভ্য বুনো মানুষগুলির কাছে ওসব

উঁচুদরের ভাবপ্রবণতার কোন দাম নেই, সত্য সত্যই অসুস্থ হয়ে সে যদি গিয়ে পড়ে ওদের মধ্যে, তার জন্য যা দরকার সব ওরা করবে এখনো, পৌঁছে দেবে কোনো সভ্য ভদ্রলোকের বাড়ী কিম্বা সদরের হাসপাতালের কিন্তু ওদেরই একজন হবার অধিকার আর সে পাবে না। পায়ে ধরে কাঁদলেও নয়।"[৩১] এইভাবে লেখক স্বল্প পরিসরে সাঁওতালজীবনের অনালোকিত, অনালোচিত দিকের ওপর আলোকপাত করলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ১৩৬০ সালে প্রকাশিত হয় *তেইশ বছর আগে পরে* উপন্যাস শুরুর আগে লেখক জানিয়েছেন, "তেইশ বছর আগে ছাত্রজীবনে একটি করুণ কাহিনী রচনা করেছিলাম। 'অতসীমামী' নিয়ে গল্প লেখা শুরু করার পর এটি আমার দ্বিতীয় লেখা। কাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রায়।"[৩২] *ব্যথার পূজা* নামক কাহিনিটি অসম্পূর্ণ ছিল মনে করে তাকে তিনি সেই সময় গল্প সংকলনভুক্ত করেননি। এই উপন্যাসে সেই কাহিনিকেই সংশোধন করে পরিবেশন করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। জগদীশের জীবনের ট্র্যাজেডিকে ঘিরে এই উপন্যাস। জগদীশের ভুলে তার প্রেমিকার মৃত্যু হলে অনুশোচনায় নিজেকে আত্মহননের পথে নিয়ে যেতে চায় সে। এইপর্বে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে থাকতে শুরু করে জগদীশ। সেইসূত্র ধরে স্বল্প পরিসরে বিচ্ছিন্নভাবে এসেছে আদিবাসীজীবন ও আদিবাসী বিক্ষোভের প্রসঙ্গ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বের রচনায় নানা প্রসঙ্গে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কথা এসেছে। উপন্যাস *মন্দ্রমুখর* প্রকাশিত হয় ১৩৫২ সালের চৈত্র মাসে, "প্রগতি প্রকাশনী" থেকে। উপন্যাসে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের পটভূমিকায় ভাতারমারীর মাঠে, নিশ্চিন্তনগরে স্বাধীনতার আহ্বানে যুক্ত হয়েছিল – "খালি গা, নেংটি পরা–ধুলো মাখা, হাজারে হাজারে মানুষ।...হাজার হাজার হাতে হাঁসু জ্বলছে- হাজার তেলের বাঁক আর তেলপাকানো লাঠি জ্বলছে-হাজার হাজার চোখ জ্বলছে, আর বাজছে তিরিশ-চল্লিশটা নাগাড়। নতুন যুগের নতুন রণযাত্রা।"[৩৩] নিশ্চিন্তনগরে এমন অভ্যুত্থানের

পূর্বেই ভাতারমারীর মাঠে তার বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেছিল। দলে দলে যে মানুষজন মশাল হাতে এই যাত্রায় অংশ নিতে ছুটে এসেছিল ঔপন্যাসিক তাকে স্পষ্ট করলেন এইভাবে- "এ আহ্বান ওরা শুনেছে নিজের সত্তার ভেতর থেকে- শুনেছে স্নায়ুশিরার রক্ত-কল্লোলে। পনেরো-বিশটা মশালের আলোয় - এই জনশূন্য বিশাল প্রান্তরে এই মানবগুলো যেন অন্য কোনো জগতের বাসিন্দা। রাজবংশী আর সাঁওতালদের ভীতি-বিহ্বল মুখ – যারা পৃথিবীর মাটির সব চাইতে অন্তরঙ্গ আত্মীয় অথচ পৃথিবীর কাছেই চিরকাল অপরাধী হয়ে আছে - তারা আজ কোন্ নতুন অধিকারে হঠাৎ আত্ম-চেতন হয়ে উঠল এমন ভাবে যে সে মুখে নির্ভীক নিঃসংশয়তার বজ্র-কঠোর রেখা পড়েছে এসে?"[৩৪] মাটির সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকা পৃথিবীর সহজ সরল অথচ দীর্ঘদিনের আত্মসচেতনতাহীন, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষগুলোর স্বরূপ লেখকের স্বরে ধরা পড়েছে। অধিকার সম্পর্কে উদাসীন, নিরুত্তাপ মানুষগুলো স্বাধীনতার দাবিতে মুখর হয়েছে এই উপন্যাসে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *বীতংস* গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় *মন্দ্রমুখর* প্রকাশের বছরেই, একেবারে প্রথমদিকে (নববর্ষ, ১৩৫২সাল)। গল্পগ্রন্থের নামগল্প জুড়ে সাঁওতাল পরগণার এক সাঁওতালগ্রামের মানুষদের বিশ্বাস, উৎসব, জীবনচর্চা ও সাঁওতালদের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সাধু ছদ্মবেশী আড়কাঠি সুন্দরলালের সাঁওতালদের বাস্তুচ্যুত করে আসামের চা-বাগানের মজুর বানিয়ে তোলা। পুরো গল্পজুড়ে সুন্দরলালের সেই মজুর বানিয়ে তোলার ফাঁদের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। গল্পের সূচনায় নিসর্গ বর্ণনায় সেই ফাঁদেরই যেন আভাস- "আকাশে সন্ধ্যার রঙ। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের অরণ্যমণ্ডিত চূড়োয় চূড়োয় নিবিড় ছায়া সঞ্চারিত হতে লাগল। শালবন ঘেরা দূরের উপত্যকাটা থেকে যে ছোট পথটা ঘুরে ঘুরে ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাকে দেখে মনে হয় যেন মৃত একটা বিশাল অক্টোপাসের প্রসারিত নিশ্চল বাহু। যেন মৃত্যুর আগে একবার ওই পাহাড়ের মুখের ভেতরে টেনে আনবার শেষ চেষ্টা করেছিল।"[৩৫] সুন্দরলালের জগৎ-জীবন-অর্থ

সম্পর্কে সাধুসুলভ ঔদাসিন্য ও নির্লিপ্ততার ভান সহজ সরল সাঁওতালরা ধরতে পারেনি। সাঁওতালদের মন ও বিশ্বাসের ওপর পাকাপোক্ত জায়গা করে ফেলেছিল সুন্দরলাল। অলৌকিক শক্তিতে প্রবল বিশ্বাসী সাঁওতালদের কাছে ক্রমেই সুন্দরলাল হয়ে উঠেছিল ''মহাপুরুষ'', সুন্দরলালের অলৌকিক ক্ষমতায় ক্রমে নিসন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল সাঁওতালরা। হাতে ভবিষ্যৎ দেখা, ভূত ছাড়ানোর দক্ষ অভিনয় ও শিকড় বাকড় দিয়ে রোগ সারিয়ে দেওয়ার পথ ধরে সুন্দরলালের সাঁওতালপাড়ায় এই প্রতিপত্তি। এই প্রতিপত্তি, বিশ্বাসের ওপর ভর করে কোনো এক মহুয়া-মাদলের জ্যোৎস্না রাতে সুন্দরলালের ওপর সিঙবোঙার ভর হয়, ভরপ্রাপ্ত সুন্দরলাল দক্ষ অভিনয়ে বলে দেয় সেই গ্রামে মড়ক লাগবে। ভীত, অন্ধবিশ্বাসী সাঁওতালরা সুন্দরলালকে বিশ্বাস করে মড়কের ভয়ে ও সিঙবোঙার নির্দেশে গ্রাম ত্যাগ করে চলে উত্তরের পথে, আসামের পথে। আড়কাঠি সুন্দরলাল হিসেব করে- "...আসামের চা-বাগানে কুলি যোগানো কী যে অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সাহেব জানে। কালাজ্বরে দলে দলে লোক মরছে, আশপাশ থেকে একটি কুলি আনবারও জো নেই। বুধনী বাদ দিয়ে - আড়কাঠি সুন্দরলাল হিসেব করতে লাগল : বুধনিকে বাদ দিলে, বেয়াল্লিশজন কুলিতে তার কমিশন পাওনা হয় কত!"[৩৬] বুধনির হিসেব অন্য, সাধারণ কুলি মজুর যোগানের কমিশন নয়, সুন্দরলাল জানে বুধনির আদিবাসী সৌন্দর্য ও যৌবনের অন্য মূল্য আছে। সেই হিসেবই সে কষেছিল। শিল্পসার্থক এই গল্পে অলৌকিকত্বের ওপর অন্ধবিশ্বাস, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা সাঁওতালদের পারস্পরিক দ্বেষ-হিংসা, ক্ষতি করার মানসিকতাকেও তিলক সাঁওতালের প্রসঙ্গে তুলে এনেছেন সাহিত্যিক। অবশ্য এই ক্ষতি করার জন্যেও সে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল অলৌকিক শক্তিতে-বাণমারাতে-ডানবৃত্তিতে। *স্বর্ণসীতা* উপন্যাসরূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ সালে। এর পূর্বে তা গল্পাকারে প্রকাশিত। উপন্যাসটি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আন্দোলনের পথকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় অনুপমার কাহিনি। উপন্যাসের

বিস্তৃত অংশজুড়ে কাহিনির সংগঠিত স্থানরূপে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু উপন্যাসের মূলধারক সেই অনার্য মানুষজন নয়। উপন্যাসের দু'টি পৃথক সময় ও পৃথক পটভূমি আছে। প্রথম অংশের সাত বছর পর দ্বিতীয় অংশের ঘটনাপ্রবাহ, স্থান উত্তর বাংলার শবরপল্লি। লেখক শবরপল্লি বললেও আদিবাসী সাঁওতাল গ্রাম ও সাঁওতাল মানুষদের কথাই উপন্যাসে পাই- "...নিচে ঢালু জমি বা টাল যেখানে আরম্ভ হয়েছে, তার থেকে মাইলখানেক সরে এলে একখানা গ্রাম পাওয়া যাবে। গ্রাম বটে, কিন্তু ভদ্রলোকের বসতি নেই। দু-চার ঘর ওঁরাও, তুরী আর মুণ্ডা। আর আশেপাশে যেসব তালবনে ঘেরা রাঙা মাটির টিলা সেগুলো সাঁওতালদের আস্তানা।"[৩৭] বরেন্দ্রভূমিতে সাঁওতালদের এই আস্তানা তৈরির ইতিহাসকে, পরবর্তীকালের কাহিনিপর্বে জমিদার সোমনাথের সাঁওতালদের বঞ্চিত করতে চাওয়া শাসকের চিরকালীন মানসিকতাকে তুলে ধরলেন লেখক এইভাবে- "যেদিন পরিত্যক্ত বরেন্দ্রভূমি মৃত - অতীতের কঙ্কাল বুকে করে পড়ে ছিল মজা দীঘিতে, বিশৃঙ্খল অরণ্যে আর ঊষর মৃত্তিকায় সেদিন ওরাই এসে এখানে আস্তানা বেঁধেছিল ঘরছাড়া যাযাবরের দল। সেদিন কোনো জমিদার ওদের কাছে খাজনা চায়নি, পত্তনির জন্যে নজরানা দাবি করেনি কেউ। কিন্তু মরামাটি যখন ওদের লাঙলের ফলায় প্রাণ পেল, যখন অনাবাদী জমিতে ফলতে লাগল আশু-আমন-বোরো, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের লোভও এল এগিয়ে।"[৩৮] জমিদারবাড়ি মাথা তুলল। তবু জমিদার গিরিশনাথের আমলে অধিবাসী সাঁওতালদের কোনও অসুবিধা হয়নি। কারণ, জোর করে খাজনার দাবি তিনি করেননি, তাদের ভালোবাসার উপহারেই তিনি খুশি ছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ও জমিদার গিরিশনাথের পুত্র সোমনাথের হিসেবের অঙ্ক আলাদা, বিলাসিতায় ক্রমাগত ঋণে ডুবতে বসা সোমনাথের প্রচুর টাকার প্রয়োজন। নালার যে মাছে এতদিন সাঁওতালদের নিঃশর্ত অধিকার ছিল, সেই ডাঁড়ার ওপর লোভের থাবা বসিয়েছে নব্যধনতন্ত্র। অবাঙালি

মহলদার টাকার বিনিময়ে ইজারা নিতে চায় ডাঁড়ার। সাঁওতালদের খেপে ওঠার আশঙ্কার কথা ঔপন্যাসিক শোনালেও বাস্তবে তেমন কোনো পরিবেশ রচিত হয় না, বরং এই বিষয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় অরুণ ও সোমনাথের মধ্যে। অরুণ সাঁওতালপাড়ায় আশ্রম খুলেছে, তাদের শিক্ষিত করে তুলতে, অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেয়েছে এবং এই নিয়ে ও অনুপমাকে ঘিরে তার বিরোধ তৈরি হয়েছে জমিদার সোমনাথের সঙ্গে। উপন্যাসে সাঁওতালপাড়ার বিবরণ আছে, সাঁওতাল জীবনচর্চার ধারণা দেওয়া আছে, কিন্তু কোনো সাবঅল্টার্ন ভয়েস নেই ; অন্তত দেবার চেষ্টাও নেই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *লালমাটি* উপন্যাসটি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী বরেন্দ্রভূমিতে স্বাধীন পাকিস্তানের জন্মকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ, স্বার্থপরতার কাহিনি, যেখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতির অনুষঙ্গে এসেছে সাঁওতালদের জীবন। উপন্যাসের শেষে শোষক-শোষিতের স্পষ্ট শ্রেণিকরণে নিম্নবর্গীয় গরীব হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে তাদের একসারিতে দাঁড় করিয়ে নববিদ্রোহের আভাস দিলেন ঔপন্যাসিক- "বুড়ো সোনাই মণ্ডল থেকে টুলকু মাঝির ব্যাটা ধীরুয়া পর্যন্ত; জরাতুর শার্দূল থেকে নাগশিশু অবধি। হোসেনের দল আর তুরীরা। কৈবর্ত-বিদ্রোহের নবজন্ম।"[৩৯] বাংলা কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে আঞ্চলিকতার বিশ্বস্ত ও ব্যাপক রূপায়ণের সূত্রপাত। পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, নারায়ণ সান্যাল, প্রফুল্ল রায় প্রমুখের হাতে অন্ত্যজ ও প্রান্তিক মানুষদের গোষ্ঠীজীবনচর্চা। সেই ধারার সূত্রেই বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবনচর্চার প্রবেশ ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। সাম্প্রতিক সময়ে ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, অনিল ঘড়াইদের কলমে এই ধারা যেমন গতি পেয়েছে তেমনই বিষয় বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য,*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলিকাতা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃষ্ঠা- ২

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য,*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলিকাতা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃষ্ঠা- ৪

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলিকাতা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃষ্ঠা- ৭-৮

৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলিকাতা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃষ্ঠা- ১১২

৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলিকাতা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃষ্ঠা- ২১০

৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলিকাতা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃষ্ঠা- ২২৭

৭। মহাশ্বেতা দেবী, ‘‘ভূমিকা’’, *ব্যাধখণ্ড,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৭

৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিবিধ প্রবন্ধ,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ৩১৯

৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিবিধ প্রবন্ধ,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা- ৩২২

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘‘সঞ্জীবচন্দ্র পালামৌ’’, *পালামৌ,* পরিশিষ্ট ৩, সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৫৫

১১। শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ‘‘কোল-জাতির সংস্কৃতি’’, *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত/ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১২০-১২১

১২। শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন, ‘‘বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি গোড়ার কথা’’, *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত/ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৪৫

১৩। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড*, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৭

১৪। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পালামৌ*, দ্বিতীয় অংশ, সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৪

১৫। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাজকাহিনী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষোড়শ মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৩৩

১৬। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাজকাহিনী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষোড়শ মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৫১

১৭। শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ‘‘কোল-জাতির সংস্কৃতি’’, *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত/ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১২৬

১৮। কর্নেল টড, *রাজস্থানের ইতিবৃত্ত, মিবার*, শ্রী শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র, কলকাতা, ১৯২৯, পৃষ্ঠা- ১৭-১৮

১৯। স্বর্ণকুমারী দেবী, "বিদ্রোহ", *স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী,* শ্রীমতী বাণী রায় সম্পাদিত, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৪, পৃষ্ঠা- ১৮৩

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অভিভাষণ", *পল্লীপ্রকৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৯৩, পৃষ্ঠা- ১৭৪

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বীথিকা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৪২, পৃষ্ঠা- ১৩০

২২। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পাতালপুরী,* শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১, পৃষ্ঠা- ২০

২৩। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পাতালপুরী,* শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১, পৃষ্ঠা- ৫

২৪। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *পাতালপুরী,* শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১, পৃষ্ঠা- ২৩

২৫। তাপস বসু, "পথিকৃৎ শৈলজানন্দ, উত্তরসূরি তারাশংকর : প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা", *পশ্চিমবঙ্গ* পত্রিকা, শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, ১৪০১, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃষ্ঠা- ১৩২

২৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "আরণ্যক", *অরণ্যসমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,* চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল সম্পাদিত, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১৪৬

২৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "আরণ্যক", *অরণ্যসমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,* চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল সম্পাদিত, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩৭৮

২৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "আরণ্যক", *অরণ্যসমগ্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,* চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল সম্পাদিত, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৬২

২৯। ড. সরোজ মোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য,* গ্রন্থালয় প্রা. লি, কলকাতা, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৮৯, পৃষ্ঠা- ২৫৫

৩০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ''দর্পণ'', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা, মানিক গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড,* গ্রন্থালয় প্রা. লি, কলকাতা, বিশেষ সংস্করণ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা- ৯০-৯১

৩১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ''দর্পণ'', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা, মানিক গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড,* গ্রন্থালয় প্রা. লি, কলকাতা, বিশেষ সংস্করণ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা- ১০০-১০১

৩২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ''তেইশ বছর আগে পরে'', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা, মানিক গ্রন্থাবলী দশম খণ্ড,* গ্রন্থালয় প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৭ই মার্চ, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ৩

৩৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ''মন্দ্রমুখর'', *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,* আশা দেবী, অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮৮, পৃষ্ঠা- ১৪৬

৩৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ''মন্দ্রমুখর'', *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,* আশা দেবী, অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮৮, পৃষ্ঠা- ১৩৭

৩৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ''বীতংস'', *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, প্রথম খণ্ড,* আশা দেবী, অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৫৯, পৃষ্ঠা- ৫৫৪

৩৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘‘বীতংস’’, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, প্রথম খণ্ড,* আশা দেবী, অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৫৯, পৃষ্ঠা- ৫৬৪-৫৬৫

৩৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘‘স্বর্ণসীতা’’*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, প্রথম খণ্ড,* আশা দেবী, অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৫৯, পৃষ্ঠা- ১৫০

৩৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘‘স্বর্ণসীতা’’*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, প্রথম খণ্ড,* আশা দেবী, অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৫৯, পৃষ্ঠা- ১৫১

৩৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘‘লালমাটি’’, *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড,* আশা দেবী, অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯০, পৃষ্ঠা- ৩৭৬